শবেবরাত ঃ একটি পর্যালোচনা

হাফেজ মাওলানা ড. আবদুল জলীল

শবেবরাত শব্দটি আরব বিশ্বে পরিচিত না হলেও পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশে একটি অতি পরিচিত ও সম্মানিত নাম। সাধারণ জনগণ যাকে 'ভাগ্য রজনী' বলে মনে করে। 'শব' শব্দটি ফার্সি যার অর্থ রাত আর 'বরাত' শব্দটিও ফার্সি যার অর্থ ভাগ্য। একসাথে এর অর্থ ভাগ্য রজনী। সাধারণত এ কথা বহুল প্রচলিত যে, এ রাতে মানুষের ভাগ্য লেখা হয়। সারা বছরের খাওয়া-দাওয়া, রুজি-রোজগার ও জীবনযাত্রা কার কেমন হবে আর কে জন্ম নেবে, কে মারা যাবে, কে জীবিত থাকবে সবই আল্লাহতায়ালা এ রাতেই নির্ধারণ করে থাকেন এবং তার নির্দেশে ফেরেশতারা তা লিখে রাখেন। সুতরাং ভাগ্য পরিবর্তনের এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য এ রাতে মসজিদগুলোতে ভিড় উপচে পড়ে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যতটুকু নয় তারচেয়ে বেশি, দুনিয়াবি জিন্দেগিতে ভালো থাকার জন্য, ভালো খাওয়া-পরার জন্যই অধিকাংশ এ রাতের ইবাদতে আগ্রহী হয় বেশি। যার ফলে দেখা যায় সারাবছর যারা ফরজ নামাজের জন্য মসজিদে আসে না তারা এ রাতে সুন্দর মুসাল্লা হাতে নিয়ে আগে আগে মসজিদে এসে জায়গা করে নেয়, ফরজের চেয়ে এ রাতের নফল ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়, এমনকি কুরআনে উল্লিখিত মহিমান্বিত কদরের রাতেরও এত গুরুত্ব দেয়া হয় না। এ ধারণার মূলে রয়েছে কিছু আলেম-উলামা ও ইমাম সাহেবানের ওয়াজ-নসিহত এবং বাংলায় রচিত তত্ত্ব ও তথ্যবিহীন 'বাংলাবাজারি' কিছু ইসলামী বই-পুস্তক। আর তাদেরও ভিত্তি হলো, সূরা দুখানের এ আয়াত সম্পর্কে রাবি ইকরিমার বর্ণনা ঃ 'কসম, সুস্পষ্ট কিতাবের! আমি তো তা নাজিল করেছি এক মুবারক রজনীতে। আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরিকৃত হয় আমার আদেশক্রমে (সূরা দুখান, আয়াত নম্বর ২-৫)। ইকরিমার বর্ণনামতে, এ আয়াত দ্বারা মধ্য শাবানের রাত তথা 'শবেবরাত' বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ ইকরিমা যাঁর মুক্ত দাস ও রাবি ছিলেন সেই মুফাসসির সম্রাট হজরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাঃ বলেন, এ আয়াতের দ্বারা লায়লাতুল কদর তথা শবেকদর বোঝানো হয়েছে। এর পেছনে শক্তিশালী প্রমাণ হলো কুরআনুল কারিমের আয়াত ঃ 'রামাদান মাস। এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাজিল করা হয়েছে' (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৫) এবং 'নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি কদরের রাতে (সূরা আল-কদর-১)। এ আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কদরের রাতে কুরআন নাজিল হয়েছে এবং কুরআন নাজিলের সে রাতকেই সূরা দুখানের ওই আয়াতে 'বরকতময় রজনী' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ওই রজনীতে সবকিছু নির্ধারণ করা হয়। আর নির্ধারণ করারও ব্যাখ্যা হলো, সবকিছু তো আগেই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন ওই রাতে (কদরের রাতে) শুধু আগামী এক বছর সংঘটিত বিষয়াদি লিখে তা বাস্তবায়নের জন্য ফেরেশতার কাছে হস্তান্তর করা হয়। সুতরাং কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনায় যখন প্রমাণিত হচ্ছে যে, ওই রজনী হলো কদরের রজনী তখন তা বাদ দিয়ে ইকরিমার মতো একজন দুর্বল রাবির বর্ণনা

কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
তবে মধ্য শাবানের ওই রাতে ভাগ্য নির্ধারণ না হলেও এ রাতে নিভৃতে ইবাদতের ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। এ রাত সম্পর্কিত হাদিসে যেসব ফজিলত ও মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা লাভ করার জন্য একজন মুমিন বান্দার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে এটাই স্বাভাবিক।
রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে যদি তা লাভ করা যায় তাহলেও তা কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। এ রাতের ফজিলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক কাল্পনিক ও মনগড়া বর্ণনার ছড়াছড়ি দেখা যায় কিছু বাংলা অজিফার বই-পুস্তক ও সাম্প্রতিককালের কিছু পত্রপত্রিকায়। সেগুলো বাদ দিয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থগুলোয় যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় এ রাতের মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য তাই যথেষ্ট। হাদিসগ্রন্থগুলোয় এ রাতকে 'শাবানের মধ্য রাত' (লায়লাতুল-নিসফ মিন শাবান) বলে অভিহিত করা হয়েছে। আরব বিশ্বে এবং হাদিস তাফসির গ্রন্থে রাতটি এ নামেই পরিচিত।
হাদিসগ্রন্থগুলোয় এ রাতের ফজিলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ
১. হজরত মুআজ ইবন জাবাল রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি নবী করিম সাঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাঃ ইরশাদ করেন, আল্লাহতায়ালা মধ্য শাবানের রাতে তার সৃষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। অতঃপর তিনি মুশরিক ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া অন্য সবাইকে ক্ষমা করে দেন (সাহিহ ইবন হিব্বান)। ইবন হিব্বান ছাড়াও বিভিন্ন ইমামের মতানুসারে হাদিসটি সাহিহ। তাছাড়া জঈফ ও মাওজূ হাদিসের কট্টর সমালোচক নাসিরুদ্দীন আলবানীও হাদিসটিকে সাহীহ বলেছেন। হজরত আবু মূসা রাঃ থেকেও হাদিসটি বর্ণিত আছে, যা সুনান-ই ইবন মাজাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাঃ থেকেও হাদিসটি বর্ণিত আছে, যা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল রঃ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। ওই বর্ণনায় 'বিদ্বেষী ও হত্যাকারী' আল্লাহর এ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে বলে উল্লিখিত হয়েছে। এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, এ রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সীমাহীন ক্ষমা ও রহমত অবতীর্ণ হয়।
২. হজরত আলী ইবন আবি তালিব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন, যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন সে রাত তোমরা ইবাদতে কাটাও এবং সে দিনটিতে রোজা রাখ। কারণ সূর্যাস্তের পরপরই সে রাতে আল্লাহ তায়ালা প্রথম আকাশে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছ কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? কোনো রিজিকপ্রার্থী আছ কি, যাকে আমি রিজিক দান করব? কোনো বিপদগ্রস্ত আছ কি, যাকে আমি বিপদ থেকে উদ্ধার করব? এভাবে ফজর পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে বলে আল্লাহর ঘোষণা অব্যাহত থাকে (সুনানে ইবন মাজাহ)।
৩. হজরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত (এক দীর্ঘ হাদিসে), তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ-কে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি তাকে খুঁজতে বের হয়ে দেখলাম যে, তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দোয়া করছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আয়েশা তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তোমার ওপর জুলুম করেছেন? হজরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহতায়ালা প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন। অতঃপর বিশালসংখ্যক মানুষকে তিনি ক্ষমা করে দেন (তিরমিযি, মুসনাদে ইমাম আহমাদ)।
৪. হজরত আয়েশা রাঃ-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, একবার রাতে রাসূলুল্লাহ সাঃ নামাজে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, আমার ধারণা হলো, তিনি বুঝি ইন্তেকাল করেছেন। 'আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে নাড়া দিলাম। ফলে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ে উঠল। তিনি নামাজ শেষ করে আমাকে বললেন, হে আয়েশা (অথবা তিনি বলেছিলেন হে হুমায়রা)! তোমার কি এ আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দীর্ঘ সিজদা দেখে আমার আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি বুঝি ইন্তেকাল করেছেন! নবী করিম সাঃ বললেন, তুমি কি জানো এটা কোন

রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন! রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এটা হলো মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ তায়ালা মধ্য শাবানের রাতে তার বান্দার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। তাই তিনি ক্ষমাপ্রার্থীদের ক্ষমা করেন। দয়াপ্রার্থীদের প্রতি দয়া করেন এবং হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীদের তাদের অবস্থায় রেখে দেন (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান)।

শেষের হাদিস দু'টির সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও ফজিলত ও আমলের ক্ষেত্রে এ ধরনের জঈফ হাদিস গ্রহণযোগ্য বলে উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মত। এসব হাদিসের আলোকে দেখা যায়, মধ্য শাবানের রাতটি অতিশয় মর্যাদাপূর্ণ।

তাই নেক আমলকারী আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভে প্রত্যাশী এবং প্রতিযোগী মাত্রেরই এ রাত জেগে ইবাদত করা উচিত। এ জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালেহীনের অধিকাংশই এ রাতের ইবাদতের প্রতি যত্নবান হতেন। তবে হজরত রাসূলে করিম সাঃ যেহেতু নিজ গৃহে একাকী ও নিরিবিলি অবস্থায় এ রাতে ইবাদত ও দোয়া মোনাজাত করেছেন বলে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং সাহাবায়ে কিরামও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ রাতের ফজিলত ও মর্যাদা লাভের চেষ্টা করেছেন তাই আমাদেরও যার যার ঘরে একাকী ও নিরিবিলি ইবাদতের মাধ্যমে রাতটি উদযাপন করা উচিত। দীর্ঘ রুকু সিজদা ও কিরাতসহকারে নামাজ আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ-তাহলিল, জিকির-আজকার, তওবা-ইসতিগফার ও দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের চেষ্টা করা উচিত। হৈ-হুল্লোড় করা, দলবদ্ধভাবে কবর জিয়ারত করা, আতশবাজি, আলোকসজ্জার কোনোটিই কাম্য নয়।

মসজিদের মাইকে দলবদ্ধভাবে জিকির করা থেকেও বিরত থাকা উচিত। কারণ একদিকে তা যেমন সুন্নাতের খেলাফ অন্যদিকে তেমনি তার

ফলে বাসায় ইবাদতরত ব্যক্তিদের ইবাদতে এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে, যা শরিয়াতে সম্পূর্ণরূপে হারাম।

নফল ইবাদত করতে গিয়ে হারামের গুনাহ করে ফেলা কারো কাম্য হতে পারে না।

দীর্ঘ নামাজ আদায় বা তিলাওয়াত করতে গিয়ে ঘুম এসে গেলে এবং ঘুমের প্রাবল্য দেখা দিলে হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে নেয়া উচিত, যাতে গভীর মনোনিবেশসহকারে আল্লাহর ইবাদত করা যায়। অনেক বাংলা অজিফা গ্রন্থে আছে, এত রাকাত নামাজ পড়তে হবে। প্রতি রাকাত এতবার সূরা ইখলাস দিয়ে পড়তে হবে এসবের কোনো ভিত্তি নেই। এ মহান রাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও ক্ষমা লাভের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি

গ্রহণ করা এবং সব গুনাহ ও নাফরমানিমূলক

কাজ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে ওই রাতের

ফজিলত ও মাহাত্ম্য লাভে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

শবেবরাত ঃ আমরা কিভাবে অতিবাহিত করব

আবদুল আজীজ আল-হেলাল

শবেবরাতকে 'লাইলাতুল বারাআত' নামে অভিহিত করা হয়। 'লাইলাতুন' একটি আরবি শব্দ এবং 'শব' ফারসি শব্দ। উভয় শব্দের অর্থ রাত। অপর দিকে 'বারাআত' শব্দের অর্থ নাজাত, নিষ্কৃতি বা মুক্তি। এই রাতে আল্লাহর বান্দারা মহান আল্লাহপাকের ক্ষমা লাভ করেন বলে এ রাতকে 'লাইলাতুল বারআত' বা শবেবরাত বলা হয়। হাদিস শরীফে ১৫ শাবানের রাত 'লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান' অর্থাৎ অর্ধশাবানের রাত হিসেবে বিবেচিত। শাবানের মধ্যবর্তী রাতের মর্যাদা বর্ণনায় অনেকে সূরা দুখানের (২-৪) আয়াতগুলো উল্লেখ করেন; মহান আল্লাহ বলেন, 'সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। আমি একে এক বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি; কারণ আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম এ রাতে প্রতিটি বিষয় বিজ্ঞোচিত ফায়সালা করা হয়।'

প্রকৃতপক্ষে ওই আয়াতে কারিমায় 'লাইলাতুল কদরকে বুঝানো হয়েছে। অনেকে 'লাইলাতুল বারাআতকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত মনে করে এই আশায় ইবাদত-বন্দেগি করেন যে এ রাতের দ্বারা তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। এ ক্ষেত্রে তারা পূর্বোক্ত আয়াতটিই প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন। যারা এ পক্ষে মত পেশ করেন তাদের মধ্যে হজরত ইকরামা রাঃ-এর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাঃ, ইবনে উমার রাঃ, মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান বসরি, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবনু জায়েদ, আবু মালেক, দাহহাকসহ জমহুর মুফাসসির একমত হয়েছেন, এটা রমজানের সেই রাত, যাকে 'লাইলাতুল কদর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবনুল আরাবি বলেন, শাবানের মধ্যবর্তী রাতে ভাগ্যের ফায়সালা হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত কোনো হাদিসই নির্ভরযোগ্য নয়। তাই সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করাই উচিত। (আহকামুল কুরআন)

শাবানের মধ্যবর্তী রাতের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসগুলোর মধ্যে বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও বিশুদ্ধতার শর্ত পূরণের দিক থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদিসটির বর্ণনাকারী আবু মুসা আশয়ারি রাঃ। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহ শাবানের মধ্যবর্তী রাতে তার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত আর সকলকে ক্ষমা করে দেন।' (ইবনে মাজাহ-১০১, শুআবুল ইমান লিল-বাইহাকি-৩/৩৩২, সহিত ইবনে হিব্বান-১২/৪৮১) এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ থেকে এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাতে তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল সাঃকে রাত্রে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি তাকে খুঁজতে বেরিয়ে দেখি, তিনি 'জান্নাতুল বাকি'তে আকাশের দিকে হাত তুলে দোয়া করছেন। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি এই আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তোমার প্রতি কোনো জুলুম করেছেন! (হজরত আয়েশা বলেন) আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধারণা হলো যে, সম্ভবত আপনি অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গিয়ে থাকবেন। তখন রাসূল সাঃ বললেন, শাবান মাসের মধ্যরাতে আল্লাহতায়ালা প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন। অতঃপর কালব গোত্রের বকরিগুলোর পশম পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করেন। (তিরমিজি শরীফ-১/১৫৬, ইবনে মাজাহ-১০০, মুসনাদে আহমদ-৬/২৩৮, বায়হাকি ৩/৩৭৯, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ-১/৩৩৭, বগাবি-৪/১২৬, মিশকাত-১১৪) আল বাণী বলেন, এই হাদিসের সনদে কোনো ত্রুটি নেই। (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ-৩/১৩৭)

উপরে উল্লিখিত হাদিস থেকে বোঝা যায় শাবানের মধ্যরাতের ইবাদত কোনো সামষ্টিক ইবাদত নয়, বরং এটি একান্ত ব্যক্তিগত ইবাদত। আল্লাহপাক এ রাতে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাদের মাফ করে দেন এবং যারা রহমত চান তাদের প্রতি রহম করেন। অতএব, এক রাতে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতে হবে, চাইতে হবে তার কাছে রহমত। আর মাগফিরাত ও রহমতপ্রাপ্তির জন্য অন্যান্য নফল নামাজের মতো নামাজ আদায় করা। এ প্রসঙ্গে হজরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস ইমাম বায়হাকি রহঃ তার শুআবুল ঈমান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রাসূল সাঃ এ রাতে দীর্ঘ সালাতে রত হন। তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করেন যে হজরত আয়েশা রাঃ এতে তার ওফাতের আশঙ্কা করেছিলেন (বায়হাকি ঃ শুআবুল ঈমান-৩/৩৮২)। এ ব্যাপারে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে, শবেবরাতের নামাজ বলে কোনো নির্দিষ্ট সালাত নেই। কেউ কেউ এ রাতে বিশেষ নিয়মে ১০০ রাকাত, ১০০০ রাকাত, ৬ রাকাত নামাজ আদায় করে থাকেন। এ রাতে এত রাকাত সালাত আদায় করতে হবে, প্রথম রাকাতে অমুক সূরা এতবার, দ্বিতীয় রাকাতে অমুক সূরা এতবার পড়তে হবে এমন কোনো নিয়ম শরিয়তে প্রমাণিত নয়। এক কথায় স্বাভাবিক নিয়মেই সালাত আদায় করতে হবে। তবে সালাতে দীর্ঘ কিরাত হতে পারে, হতে পারে দীর্ঘ সিজদাও। শবেবরাতের সালাত আদায়, তাসবিহ-তাহলিল সব কিছুই নফল ইবাদত। আর নফলের জন্য একাকিত্ব ও নির্জনতা সবচেয়ে উত্তম। সুতরাং এই রাতে সামষ্টিক ইবাদত না করে ব্যক্তিগতভাবে ইবাদত করতে হবে। আল্লামা ইবনে নুজাইম রহঃ বলেন, ফজিলতপূর্ণ রাতে রাত জাগরণের জন্য সমবেত হওয়া মাকরুহ। সর্বাবস্থাই এটি মাকরুহ; মসজিদে হোক কিংবা অন্যত্র যেকোনো স্থানেই হোক। কেননা রাসূল সাঃ এ রকম করেননি, সাহাবায়ে কেরামও করেননি এবং আহলে হিজাজও করেননি। যাদের মধ্যে আতা ইবনে আবি রবা এবং ইবনে আবি মুলাইকার মতো ব্যক্তিত্ব আলেমও আছেন। তা ছাড়া ফুকাহায়ে মদিনা এবং ইমাম মালেক রহঃ-এর শাগরিদগণও এই প্রচলিত নিয়মে

সমবেত হওয়াকে বিদ'আত বলে আখ্যা দিয়েছেন। (তাহাতাবি-৩২৬) বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক আলেম আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি দাঃ বাঃ শবেবরাতের রোজা সম্পর্কে বলেন, সমগ্র হাদিস শাস্ত্রে একটি মাত্র হাদিস ১৫ শাবানের রোজা সম্পর্কে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাও আবার দুর্বল। সুতরাং সেই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে শবেবরাতের রোজাকে মুস্তাহাব কিংবা সুন্নত বলা যাবে না। তবে ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোজা রাখার ফজিলত প্রমাণিত আছে। ২৭ ও ২৯ শাবান রাসূল সাঃ রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন, রমজানের দু-এক দিন আগে তোমরা রোজা রেখ না, যাতে করে রমজানের রোজার জন্য প্রফুল্লতার সাথে প্রস্তুত থাকতে পার। ১৫ শাবান আইয়ামে বিজের তিন দিনের (১৩, ১৪, ১৫) একটি দিন হিসাবে ফজিলতপূর্ণ। সেহেতু এই দুই কারণে কেউ যদি ১৫ তারিখের সাওম পালন করেন, তবে তিনি সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন না। এ রাতে অনেকেই এমন কিছু কাজ করেন যা শরিয়ত অনুমোদিত নয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হালুয়া-রুটির আয়োজন এবং ঘরে ঘরে এর বিতরণ। এ ছাড়া অন্য যেগুলো করা হয়ে থাকে তার মধ্যে রয়েছে মসজিদ, ঘরবাড়ি, দোকানপাট আলোকসজ্জা করা, মোমবাতি জ্বালানো, কবরস্থান ও মাজারে আলোকসজ্জা ও ভিড় করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজি ইত্যাদি সবই গর্হিত কাজ। মনে রাখতে হবে এ রাতে রাসূলে কারিম সাঃ যে কবর জিয়ারত করেছিলেন তা ছিল ব্যক্তিগত। তাই আমাদেরও সমবেত না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে কবর জিয়ারত করা উচিত। এ রাতের সবগুলো আমলই নফল পর্যায়ের, তাই এগুলোর পেছনে পরে যেন ফরজ বাদ না যায়। অর্থাৎ সারারাত জেগে থাকার ফলে যেন ফজরের সালাত কাজা না হয়ে যায়। কারণ সারাজীবনের নফল একটি ফরজেরও সমান নয়। মোট কথা শবেবরাতে রাত জাগরণের বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই এবং বিশেষ কোনো ইবাদতও নির্ধারিত নেই। মানসিক পরিতৃপ্তির সাথে যেভাবেই আল্লাহর ইবাদত করা সম্ভব, আমরা সেভাবেই ইবাদত করব। সালাত আদায় তাসবিহ-তাহলিল, দুরুদ শরীফ, কুরআন-হাদিস তিলাওয়াত ইত্যাদি যার যার সুযোগ মতো করা যেতে পারে। বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত, দীনের প্রতিটি কাজ তার সীমার ভেতর রাখা জরুরি। নিজের পক্ষ থেকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করার নাম দীন নয়। তবে শবেবরাতের আমল ও রোজা নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়; যার যার আমলের হিসাব তাকেই দিতে হবে।

লাইলাতু নিস্‌ফে শাবান

মাওলানা জাকির হোসাইন আজাদী

শবেবরাত শব্দের প্রথমটি ফারসি শব্দ আর দ্বিতীয়টি আরবি শব্দ। শব অর্থ রজনি। বরাত অর্থ ভাগ্য, বিচ্ছেদ ও মুক্তি। আরবি শাবান মাসের ১৪ তারিখ রাতকে শবেবরাত বলা হয়। আরবিতে লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুন নিসফে মিন শাবানও বলা হয়। ভারতবর্ষে এটা শবেবরাত নামে পরিচিত। তবে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের কাছে যা ভাগ্যরজনী নামে পরিচিত। আল কুরআনুল কারীমে যেমনিভাবে শবেকদর বা মহিমান্বিত রজনীর কথা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তেমনিভাবে শবেবরাতের নামে কুরআনুল কারীমে একটি আয়াতও নাজিল হয়নি। তবে রাসূল (সাঃ)-এর অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে দুর্বল সূত্রে। আমাদের দেশের অনেকেই শুনে অবাক হন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত মক্কা-মদিনা তথা মিডল ইস্টের কোথাও শবেবরাত নামে ইসলামি কোনো পর্ব ধার্য নেই। মক্কা-মদিনার মানুষ জানেই না শবেবরাত কী? তবে তারা রমজানের পূর্ব মাস হিসেবে শাবান মাসে অধিক নফল ইবাদত করে থাকেন। হাদিস শরীফেও এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রমজান হলো আল্লাহর মাস আর শাবান হলো আমার মাস। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে যত বেশি রোজা পালন করতে দেখেছি রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে এত অধিক রোজা পালন করতে দেখিনি। কেবল রোজা পালন নয় রাসূল (সাঃ) অধিক নফল নামাজ আদায় করতেন এবং সব সময় দোয়া করতেন। হে আল্লাহ, রজব ও শাবান মাসে আমাদের ওপর বরকত দাও এবং আমাদেরকে

রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দাও। এভাবে অন্য কখনো দোয়া করতেন না। শুধু রমজান পাওয়ার জন্য আগে থেকেই এই দোয়া করতেন। সে জন্য রমজান মাসের পূর্ব মাস হিসেবে শাবান মাস হলো রমজানের প্রস্তুতির মাস। শবেবরাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকেই বুঝানো হয়। অর্ধ শাবানের রাতের ফজিলত সংবলিত হাদিসটি হাসান বা উত্তম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই অর্ধশাবানের রাতের ফজিলত অন্যান্য রাতের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ফজিলত নয়। তবে অন্যান্য রাতের চেয়ে একটু গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম বায়হাকির সঙ্কলিত গ্রন্থে হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূল (সাঃ) একদা রাত্রিবেলা জাগ্রত হয়ে সালাত আদায় শুরু করলেন। সালাতের সিজদাগুলো বেশ লম্বা ছিল। একপর্যায়ে আমি জাগ্রত হয়ে তাঁর সিজদার প্রতি লক্ষ করলাম এবং ধারণা করলাম তার রূহ কবজ করা হয়েছে। এটা লক্ষ করে আমি তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ধরে নাড়া দিলাম ফলে তিনি নড়ে উঠলেন, অতঃপর আবার শান্ত হয়ে গেলেন, যখন তিনি সিজদা সমাপ্ত করলেন এবং সালাত পূর্ণ করে অবসর হলেন তখন আমাকে 'হে আয়েশা বা হে হুমায়রা বলে সম্বোধন করে বললেন, তুমি কি ধারণা করেছিলে যে, নবী (সাঃ) তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, কস্মিনকালেও আমি এরূপ ধারণা করিনি। বরং আপনার সিজদার দীর্ঘতা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, হে আয়েশা তুমি কি জান আজ কোন রাত? আমি বললাম আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন এটি হলো অর্ধ শাবানের রাত। আল্লাহতায়ালা অর্ধ শাবানের রাতে বান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং ক্ষমা ভিক্ষাকারীদের ক্ষমা করে দেন। রহমত তলবকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণদেরকে তাদের অবস্থায় বিদূরিত রাখেন।'

হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদিসে এভাবে এসেছে 'এক রাতে আমি রাসূল (সাঃ)-কে বিছানায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এরপর আমি খুঁজতে খুঁজতে বাক্বী নামক স্থানে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করছেন। আমিও তার দোয়ায় শরিক হলাম। দোয়া শেষ হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, হে আয়েশা! আজকের রাত সম্পর্কে তুমি কি জান? আমি বললাম আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ভালো জানেন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আজ হলো অর্ধ শাবানের রাত এই রাতে আল্লাহতায়ালা কলব বংশের বকরির পশম পরিমাণ গোনাহ মাফ করেন। সুতরাং এই রাতে ব্যক্তিগতভাবে অধিক নফল ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে অতিবাহিত করা যেতে পারে।

শাবান মাসের ফজিলত

অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম রফিক

মহান আল্লাহর বড় মেহেরবানি যে, তিনি বান্দাদের জন্য এমন কিছু মুহূর্ত ও সুবর্ণ সুযোগ নির্ধারণ করে রেখেছেন, যখন স্বল্প সময়ে অফুরন্ত সওয়াব ও কল্যাণ কামাই করা যায়। এগুলোর মধ্যে শবেবরাত তথা পুরো শাবান মাসটাই এক বিশেষ তাৎপর্যময় স্থান করে আছে। শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে আমাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের ভাষায় বলা হয় পবিত্র লাইলাতুল বারআত বা শবেবরাত। আর এর পক্ষকাল পরই রহমত, বরকত ও নাজাতের মাস মাহে রমজানুল মোবারক। আজ তাই চতুর্দিকে ধর্মপ্রাণ মুমিন মুসলমানদের পবিত্র শবেবরাত উদযাপনের প্রস্তুতি ও তোড়জোড়। ঘরে ঘরে মুসলিম মা-বোনদের ইবাদত ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির তামান্না। আর মসজিদগুলোতে অতিরিক্ত মুসল্লি সমাগমের সামাল দিতে নানা আয়োজন। অনেকে আবার শবেবরাত বা ভাগ্য রজনীতে অবিরাম ইবাদত-বন্দেগি, রিয়াজত সাধনার প্রত্যয় সত্ত্বেও পরদিন সিয়াম সাধনার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। আল্লাহ আমাদের সবার নেক চিন্তা ও আমলে সালেহগুলো কবুল করুন।

উল্লেখ্য, রজব এবং রমজান মাসের মধ্যবর্তী মাসটির নাম শাবান। শাবান অর্থ শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হওয়া। যেহেতু এ মাসে রোজাদারদের সওয়াব গাছপালার শাখা-প্রশাখার মতো বাড়তে থাকে তাই মাসটিকে শাবান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাসের সুসংবাদদাতা এবং পরবর্তী নিকটতম মাস হিসেবে এ মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক। এ মাস ভালোরূপে কাটাতে পারলে রমজান মাসও সুচারুরূপে অতিবাহিত হবে বলে আশা করা যায়।

পবিত্র শাবান মাস ও শাবানের বুকে ধারণকৃত বরকতময় রজনী শবেবরাতের ফজিলত ও গুরুত্বের কথা বিঘোষিত হয়েছে হাদিসে নববির অসংখ্য স্থানে। আল্লাহর প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ তো বলেই ফেলেছেন, শাবান আমার মাস আর রমজান আল্লাহর মাস। (মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহ)। আল্লাহর নবী হুজুর পুর নূর (সাঃ) এ মাসে প্রায়ই রোজা রাখতেন। হজরত আনাস বিন মালিক রঃ সে যুগের মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে বলেন, তখন শাবান মাসের আগমন ঘটলে মুসলমানরা বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করত এবং বিত্তশালীরা তাদের মালামালের জাকাত-সাদকা বিতরণ করতে থাকত ফকির মিসকিনদের কাছে যাতে অভাবগ্রস্ত পরিবারগুলো একটু স্বস্তি ও শক্তি সঞ্চয় করে ভালোভাবে অতিবাহিত করতে পারে রমজানের রোজাগুলো। আজকে আমাদের সমাজে সে ঐতিহ্যমণ্ডিত চিত্রটি বিরাজ করলে কত না সুন্দর হতো!

শাবান মাস আল্লাহর রহমত ও রেজামন্দি হাসিলের এক সোনালি সুযোগ নিয়ে আমাদের মাঝে সমুপস্থিত। পাপি-তাপিসহ সব উম্মতে মুসলিমা এ মহিমান্বিত মাসের সদ্ব্যবহার করে নিজের ইহপরকালীন জীবনকে

সৌভাগ্যমণ্ডিত করে নিতে পারি। তবে এ ক্ষেত্রে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি দরকার তা হলো খুলুসিয়ায় ও সমর্পিত মন নিয়ে আল্লাহর রেজামন্দি তালাশ করা। দেহমন উজাড় করা, প্রেম ভালোবাসা নিয়ে প্রভুর ইবাদত-বন্দেগিতে ডুবে থাকা। এ সময় কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ-তাহলিল পাঠ, রোজা ও নফল নামাজ আদায় করা আর যথাসাধ্য দান-খয়রাত করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

মধ্য শাবানের পর রমজান মাসের আগমনের আর বেশি সময় থাকে না। মাত্র ১৪-১৫ দিন। শবেবরাতে আল্লাহ মহানের কাছে পবিত্র জীবন কামনার সাথে সাথে আসন্ন রমজানে সুস্থ দেহ মন ও সুন্দর পরিবেশের জন্য দোয়া করা দরকার। এ সময় ইবাদত ও তিলাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। চাকরি-বাকরিতে সততা, ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল পথ অনুসরণ করতে হবে। সহায়তা করতে হবে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার কাজে। মসজিদ-মক্তবগুলো আবাদ করতে হবে রোজাদার মুসল্লিদের সুবিধার্থে। তাহলেই কেবল পুণ্যময় মাসগুলোর (রজব, শাবান ও রমজানের) ক্রমাগমন আমাদের জীবনে সফলতা বয়ে আনবে।

তবে একটা কথা আমরা বারবার বলে থাকি যে, আজকের সমাজ হচ্ছে সুসংস্কার ও অনৈতিকতার রমরমা বাজার। এ সুবাদে এ ধরনের বরকতময় রাত ও মাসগুলোতেও আমরা অজ্ঞতাবশত বা কুসংস্কারজনিত কারণে এমন কতক কাজ করে বসি, যা ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না আর নয় কোনো পুণ্য ধর্মের কাজ। এ ধরনের অযথা কাজকর্ম যেমন নিজের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে আর তেমনি সমাজে অন্যান্য মুমিন মুসলমান যারা ভাবগম্ভীর পরিবেশে সময়টি কাটাতে চায় তাদের ইবাদত-বন্দেগিতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; তদুপরি অপচয়ও বৈকি! যেমন আতশবাজি ও পটকা ফোটানো ইত্যাদি। এসব কাজ সর্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত।